Bipu Lahirir Atmochorito by Buddhadeb Guha

For More Books Visit www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

উপন্যাস www.MurchOna.com

বিপু লাহিড়ীর আত্মচরিত

বুদ্ধদেব গুহ

ডিঙ্গিখান তাড়াতাড়ি বা রে নেকু। পুবাকাশে ম্যাঘের ইস্টাইলটা একবার দ্যাখ, হালায় য্যান রিঠা দিয়া চুল ফুলাইয়া আইতাছে। দ্যাখছস?

হ।

তুই দেহি আজকাল শাম্পু ইকসপার্ট হইয়া গ্যাছস।

আর করি কি। তোগো মতো পড়াশুনাডা ত তেমন অইল না। অন্য কিছুর ইকসপার্ট হওন হইল না ত কিছুর ত ইকসপার্ট হইতে হয়, না কি কস?

হ।

চিন্তার কিছুই নাই। আইস্যা গেছি গিয়া।

মাছও পাইলি না একখানও। খামোখা পরান দুইডাই না যায়।

তুই হালা হিঁদু নেকু-পুষু-মনু, তর পরান যাইতে পারে যাইবে, কিন্তু মহম্মদ খইরুল শ্যাখের পরানডা অত সহজে যাইব না। জীবনে এহনে কিছু করনও হইল না আর এরই মদ্দি ইন্তেকাল হইব! কইসডা তু কি?

নেকু কইল, আমি কিছুই কই না। খালি ভাবি, তর পাল্লায় পইড়্যা আমার পরানডা শিগগিরই একদিন যাইব অবশ্যই।

তারপর একটু চুপ কইর‍্যা নেকু কইল, আইজ পদ্মফুলের মধ্যে কেউটা দুইডা য্যামন ছোবলডা দিছিল ক? তুই ঠিক টাইমে দাঁড় দিয়া তাগো ফণায় না মাইরবার পারলে আর দ্যাখন লাইগত না।

যা কইছস। লখীন্দর হইয়া যাইতি তুই। বেহুলাহীন লখীন্দর।

খইরুল কইল, আরে নেকু, খোদা যেদিন ফরমান দিবেন, স্যাদিনই যামুঅনে। আমি খোদার বান্দা। রোজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি। আমার হইবডা কি?

তারপরই খইরুল কইল, এই নেকু, তুই কোরান পড়ছস?

নাঃ হিন্দুরা আবার কোরান পড়ে নাকি?

ক্যান? মোসলা না হইলে কি পড়ন যায় না কোরান? এমদ্দি কী আছে তা জাইনবার লইগ্যা পড়ব আর ক্যান?

কী আছে তগো কোরানে? আমরা রামায়ণ, মহাভারত, গীতা পড়ি।

আছে, আছে। আল্লা ছাড়া আর কারুরেই কুক্ষনো ভয় পাইস না। বুঝছস। আর কারুর কাছেই মাথা নুয়াইবি না, কুক্ষনো না। এই আমাগো কোরানের শিক্ষা।

নেকু একটু পরই কইল, আমার বাবায় কয়, গ্রামের মোসলাগো অনেক ভাল ব্যাপার আছে।

কী রকম ক?

গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সক্কলডিই সমান গরীব, কিন্তু মোসলারা পিঁয়াজ, রসুন আর মরিচডা বেশি কইর‌্যা খায় এবং রোজই খায়। তাই অরা অত খাটাইয়া, গায়েও জোর ধরে অনেক বেশি।

তাই কয়েন নাকি তর আব্বা?

হ। বাবায় তাই কয়েন।

খইরুল কইল, এই রে! শুরু হইল পিটির পিটির। তরে বইললাম হরেন সা'র দুকান থিক্যা দুইডা বিড়ি লইয়া লই, না তুই হালায় ডরেই মইর‌্যা গেলি।

হঃ কে দেইখা ফ্যালাইব।

আর ফ্যালাইলে ফ্যালাইব। আমরা কোন মিঞারে তোয়াক্কা করি!

এই ঠাণ্ডায় বিড়ি দুইখান খাইয়া ক্যামন আরাম হইত ক' ত!

তারপরই কইল, ঘরে পৌঁছাইয়াই এক্কেরে গরম গরম মুড়ি আচারের ত্যাল দিয়া মাইখ্যা ক্যাডালের বীচি ভাজা দিয়া খাইবঅনে। শীত চইল্যা যাইব।

আর চা খাইবি না?

হ। চা ত খাওনই লাগব। আইজ আব্বা নাই, আব্বার গেলাসে কইর‌্যা খামু, বোঝলি। হিড অফ দ্যা ফ্যামিলি।

নেকু, তুই যাবি নাকি আমাগো ঘরে!

ক্যান?

জ্যাসমিন আইছে রে ফুফার বাড়ি থিক্যা। তারে দ্যাখলেইনা তর বুকের মদ্দিডা ঢিপির-ঢাপির করে!

হ। তরে কইছি আমি!

মুখে কইস নাই কিন্তু আমি বুঝছি।

হালা মিথ্যুক, তুই নিজেই ত কইছিলি আমারে। চল, এই পিটির-পিটির বৃষ্টির মদ্দি বাড়ির পিছনের পুকুরডায় সাঁতার কাটুম অনে তিনজনে। এহনে মাও ত নাই বাবার সাথে গ্যাছে। ফিইর‌্যা আইতে রাইত হইব। হাঁসগুলান, ডাহুক আর পানপায়রাগুলান পায়ে জলের ছিটা দিয়া আমাগো আগে আগে সইরা যাইব, নদীপারে গো-বক বইস্যা বইস্যা ভিজব বৃষ্টিতে– তাগো গা দিয়া তহনে গরু গরু এট্টা গন্ধ বারাইব। জ্যাসমিন সাঁতার দিতে দিতে জলের মধ্যে নক্সীকাঁথায় পদ্মফুল তোলবঅনে আর আমরা তার কমলা-রঙা ভিজা মাই দুইখান পরান ভইর‌্যা দেখুম।

তারপরই কইল, তুই কি, ছুটো না রে, কোনো ডাগর মাইয়ারে নাঙ্গা দ্যাখছস কুখনো?

ধ্যাত।

নেকু কইল। নেকুরই মতন।

হালা নেকু মুনু মুপু। দেখলি পরে জানতি– সে কী আনন্দ। শরীলডার মদ্দি এই তেরো বছর ধইর‌্যা জমাইয়া-রাখা দরকচ্চা-মারা বদরক্তগুলান সব ঝিলিক ঝিলিক কইর‌্যা ছুইট্যা বাড়াইতে চাইব– তর হাত আর পায়ের আঙ্গুলের ডগায়, তর মাথায়, তর চ্যাটে রক্ত দৌড়াইয়া আইস্যা সে যে কী ঝুনঝুনি বাজাইব তরে, কি কম্যু।

তেমন আর কুখনো আগে হয় নাই। কুক্ষনো নয়।

রুদ্ধশ্বাসে নেকু কইল, তুই কুথায় দেখলি?

হঃ হঃ তরেও দ্যাখামু।

ভয়ে, খইরুলের কথাতে নেকুর গা ছমছম কইর‍্যা উঠল।

জ্যাসমিন যখন ভিজা সালোয়ার কামিজ ছাইড়বার লইগ্যা ঐ বেড়ার ঘরের মদ্দে ঢুকব, সাপের ভয়ে একখান লাঠি হাতে কইর‍্যা, তহনে আমরা দুইজনই বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখুম। আরে রাতেই ত দ্যাখনের সুবিধা। লণ্ঠনের সোনার আলো তার দুই হাত, তার সোনালী জামবুরার মতন মাই, তার দুই থোরা, দুই থোরার মদ্দিখানের হেই সোন্দর সোন্দর ভারী সোন্দর মেহেন্দিরঙা জায়গাটার উপর পড়ব, তখন তা দেইখ্যা মন করব শালা মইর‍্যাই যাই গিয়া। পাকড়াশী স্যার, রহমান স্যার আর মৌলভী স্যারের মাইর খাইয়া পড়া-লিখা শিখনের কাম নাই আমাগো।

কিং সালোমন'স মাইনস-এর ফিলিম লইয়া আইছিলেন হ্যাড মাস্টারের সদর থিক্যা আমাগো রবিবারে দ্যাখাইবার লইগ্যা– মনে আছে তর?

হ।

হক্কলে মিলা দ্যাখছিলাম আমরা। কী ভালই যে লাগছিল।

খইরুল কইল, লোভের চোখ নাচাইয়া, চল চল আমাগো ঘরে চল।

নেকুর মনে হইতাছিল যে খইরুল য্যান তারে কিং সলোমান'স মাইনেই লইয়া যাইব। সত্য সত্যই।

হাঁইট্যা হাঁইট্যা যাইতে যাইতে পায়ের বাঁ পাশে সেই কাঠ-টগরের গাছটার সামনে আইয়া পইড়ল অরা। খইরুল কইল, কইরে নেকু। গাছখান ত তেমন বাড়ে নাই গত বছরের থিক্যা।

ক্যান, বাইড়বার কথা আছিল নাকি?

নেকু অবাক হয়ে বলল।

আছিলইত।

মুনাব্বার ভাই কইয়া দিছিল যে, যদি দুইজন মিল্যা হেই গাছের তলায় পারস মুত্তে পাশাপাশি বইস্যা, দাঁড়াইয়া নয়, তয় হেই গাছ তরতরাইয়া বাইড়্যা যাইব অনে।

তরে, আর কারে কইছিল?

আমারে আর নাফিসারে।

মুতছিলি?

হ। নাফিসা শরমাইতাছিল খুব। আমিই বুঝাইয়া পড়াইয়া লইয়্যা আইছিলাম।

তারপর দুজনে মিল্যা মুতাছিলাম। আমি ঝরঝর কইরা আর হে ছ্যারছ্যার কইরা। আমাগো আর তাগো মোতনের শব্দে তফাত হয় ক্যান কে জানে!

থো তর হেইসব কথা। এহনে এট্টু চুপ কইর‍্যা থাক দেহি। চুপ কইর‍্যা দ্যাখ একটা দিন ক্যামনে মইরা যাইতাছে একা একা আর কেউই তার এই মওতের খবর রাখে না।

নেকুর কথাতে একটুক্ষণ চুপ রইল খইরুল।

হাঁসা-হাঁসীরা থপথপাইয়া বাড়ি ফিরতাছে। হিঁদুবাড়ির বউ উঠানে চ্যাগারের পাশে দাঁড়াইয়া তাগো ডাকতাছে চৈ, চৈ, চৈ কইর‍্যা। বড় বড় গাছগুলায়, বৃষ্টি শ্যাষ হওনে পাখিরা সব একই সঙ্গে চিকুর দিয়া ডাক পাড়তাছে– মনে হয় য্যান ডাকাত পড়ছে তাগো বাড়ি।

একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতাছে ভিজা কলাগাছের পাতায় ঝরঝরানি আওয়াজ তুইল্যা। ছাইরঙা সাত ভাই

For More Books Visit www.MurchOna.com

পাখিগুলান লাফাইয়া-ঝাঁপাইয়া সন্ধ্যার শান্তি ছিঁড়া ফ্যালাইতেছে। বাদুরেরা তাগো ভিজা ডানা সপসপাইয়া খুব আস্তে আস্তে আমাগো মাথার উপর দিয়া উইড়্যা যাইতেছে। একটা লক্ষ্মীপ্যাঁচা খুব আইস্তা আইস্তা মণ্ডল গো বাড়ির দিকে গেল। তা ত যাইবই। হিরা যে বড়লোগ। সন্ধ্যার নামাজ পড়তাছে মোল্লা সাহেব। দূরের মসজিদ থিক্যা– তার আজানের শব্দ এই বৃষ্টিভিজা প্রকৃতিরে য্যান কাঁপাইয়া দিতাছে। বদ্যিপাড়া থিক্যা সন্ধ্যারতির শব্দ উঠতাছে, উলু দিতাছে কেউ কেউ– তার মধ্যে আমার স্বপ্নের সখী মলিনার গলাও চিনতে পারি য্যান আমি। মলিনার বাপটা একটা কসাই। ম্যাজাজ সর্বসময়েই টং হইয়া থাকে। ইচ্ছা করে একদিন দাও দিয়া দিম্‌নে ধড় থনে মুণ্ডুটা আলাদা কইর‍্যা।

পশ্চিমের আকাশডা রক্তের মত লাল হইয়া আছে। তারপর আস্তে আস্তে ফিকা হইতে শুরু হইল। তহনি একদল আদা গো-বক কুন্দ ফুলের মালার মত পূবের কালো আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ডে দুইল্যা দুইল্যা ঠ্যাং ছড়াইয়া ছাচা বিলের দিকে উইড়া যাইতাছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় উদলা গা শিরশির করে। মনে নানা রকম অসভ্য ভাবনা পাখির ছাওয়ের মতো ফরফর করে।

খইরুল আজ আমারে লইয়া তাগো বাড়ি যাইতেছে নাফিসারে ন্যাংটা দেখাইব বইলা। কী এক গর্হিত অপরাধের ভয়ে নেকুর মন থাইমা থাইমাই কাঁইপ্যা উঠতাছে। এই খইরুলটা ভারী "ড্যাঞ্জারাস" ছাওয়াল– হেড স্যারে কইছিলেন একদিন। হত্যই ড্যাঞ্জারাস।

উপক্রমণিকা এইটুকুই থাক, বাল্যবেলাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে। যে পরিবেশ যে আবহর মধ্যে আমরা বড় হয়ে উঠেছিলাম একটা সময় পর্যন্ত তাই এই উপক্রমণিকাতে রইল।

মানুষের জীবন যেমন ছোট তেমনই দ্রুতগামী। দেশভাগের পরে ভিটেমাটি ছেড়ে আমরা চলে আসি কলকাতা। ছেলেবেলার সব স্মৃতি, অনুষঙ্গ, পরিবেশ সবই আছে-শুধু এই 'বাঙাল' ভাষাটিকে হারিয়ে ফেলেছি। অথচ দুঃখের কথা এই যে, বাংলাদেশেই কথ্য ভাষা হিসেবে এই ভাষা লোপ পেয়ে যাচ্ছে। আমাদের ছেলেবেলাতে একশ্রেণীর মানুষ যেমন বাংলা বর্জন করে নিজেদের ছেলেমেয়েকে ইংরেজীতে কথপোকথন করতে বলে শ্লাঘা বোধ করত, বাংলাদেশেও একশ্রেণীর মানুষ এখন উষ্ণ মৃত্তিকাগন্ধী কথ্যভাষাকে বিসর্জন দিয়ে পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষাতে ফিরে আসছেন। শুধু তাইই নয়, অনেকে আবার করলুম, খেলুম, নেবু, এমনকি 'কইরিচি' 'খেইচিতে'ও চলে গেছেন। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগণ্য কবিরাও আছেন। আমার মতে এটা দুর্ভাগ্যজনক। এই হীনমন্যতাকে যত তাড়াতাড়ি ঝেঁটিয়ে বিদায় করা যায় ততই বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতের মঙ্গল।

খইরুল পড়াশুনোতে ভাল ছিল না নিচু ক্লাসে। কিন্তু উপরের ক্লাসে উঠে সে আমাদের স্কুলের একজন সেরা ছাত্র হয়। অবিভক্ত পাকিস্তানে সে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষাতে সেকেন্ড হয়। তারপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। তারপর করাচীতেই ব্যবসা করে এক মস্ত বড়লোক হয়। উনিশশ' পঞ্চান্নর পর তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়।

আমার এক মক্কেল, মারাঠী মক্কেল, মিঃ জ্যামখিন্দিকারের বিজনেস কানেকশান ছিল পাকিস্তানে। তাকে প্রায়ই করাচী, রাওয়ালপিন্ডি এবং অন্যান্য জায়গাতে যাতে হয়। উনি প্রায়ই ওর এক পাকিস্তানী অ্যাসোসিয়েট মহম্মদ খ্যায়রুল আহমেদ-এর গল্প করতেন। গত বছর শীতকালে উনি করাচী থেকে ফিরে আসার পর আমার সঙ্গে যখন মুম্বাইতে দেখা হলো বললেন, বাই দ্যা ওয়ে, বাংলাদেশে আপনার কোনো কানেকশান আছে?

বললাম, আজ আর নেই। ১৯৪৭-এর পর আমি বাংলাদেশে যাইনি। আমাকে কেউ যাওয়ার জন্যে নেমন্তন্ন করেনি। তবে আমরা ত বাংলাদেশীই। মানে এখনকার বাংলাদেশেই আমাদের দেশ ছিল। শেষ দেশ।

কোথায় ছিল?

রংপুরে। তাছাড়া বরিশালে ছিলাম মাস ছয়েক। বরিশাল জিলা স্কুলেও পড়েছি যেমন পড়েছি, রংপুরের পাঠশালা এবং জিলা স্কুলে।

তাহলে ত মিলে যাচ্ছে।

উত্তেজিত গলাতে বললেন জ্যামখিন্দিকার সাহেব।

কী মিলে যাচ্ছে?

খারুল আহমেদ তাহলে আপনার কথাই বলেন।

তারপর বললেন, আপনার নাম তো শাক্যসিংহ বলেই জানতাম। নেকু-পুষু-মুনু কি আপনার নাম ছিল– ডাক নাম?

আমি চমকে উঠলাম।

বললাম, ছিলো।

জ্যামখিন্দিকার বললেন, হোয়াট আ গ্রান্ড রি-ইউনিয়ন। আমি এখুনি ফোনে ধরছি ওঁকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্যামখিন্দিকার সাহেবের সেক্রেটারি খারুল-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে লাইনটা আমাকে দিলেন।

খারুল তার স্বভাবসিদ্ধ উষ্ণতাতে বলল, ক্যারে হালা নেকু, চিনতে পারস তর চ্যাটের বন্ধুরে?

আমি হেসে উঠে বললাম, তুই বদলাস নাই দেহি এট্টুও।

–নারে। বদলাইছি, অনেকই বদলাইছি। বদলের আরেক নামই ত জীবন।

আমরা চাই আর নাই চাই, বদলাইতে ত হয়ই।

তারপর বলল, ফোনে কথা বইল্যা হইব কি? একবার চইল্যা আয়। ক কবে আইবি? এয়ারপোর্ট থিক্যা তুইল্যা আনব আবার যেদিন যাবি সেদিন তরে এয়ারক্র্যাফটে তুইল্যা দিব অনে। মাঝে উন্য কুথাওই যাইতে পারবা না। তরে টিকিটও পাঠাইয়া দিমু অনে।

তুইই চইল্যা আ। আমি বললাম।

আমি ত যাইই প্রায়। তর পাত্তাই জানা আছিল না ত খোঁজ করুম ক্যামনে?

কবে আইবি ক?

২০০৫-এর অগাস্টে ফাইব তগো কলকাতায়।

আমার বাড়িতে উঠন লাগব।

নারে। এটা কইস না। আমার বিজনেস পার্টি ফার্টি দিতে লাগে, খাওনের শোওনের টাইমের কোন ঠিক নাই। উঠুম তাজ বেরুলেই কিন্তু রম্যু ওলওয়োজ অ্যাট ইওর ডিসপোজাল।

তারপর বলল, বিয়া করছস? সবচে সোজা কম্মোডা করছস নিশ্চয়?

করছি।

তর ওয়াইফের নাম কি?

নাফিসা।

কইস কি রে হালা, বেড়ার ফাঁক দিয়া লণ্ঠনের আলোয় দেখা নাফিসারে ভুলতে পারস নাই এখনো– শালা তুই এট্টা রিয়্যাল নেকু-পুষু-মনু।

আমি বললাম, বুঝতাছস না, এটা হইল গিয়া গ্লোবালাইজেশনের যুগ। হিন্দু মাইয়াগো নাম হইতেছে

মুসলমানোগো আর মুসলমানোগোর নাম হইতাছে হিন্দুগো মতন।

– তুই বিয়া করস নাই?

– করছিলাম। দুইবার করছিলাম। ট্যাকে নাই।

– ছাওয়াল পাওয়াল?

– ভাগ্যে নাই। হইলেও কেচাইল হইত। বিবিউ নাইলে...

– তর?

– এক পোলা এক মাইয়া।

– কি কররে তারা?

– বড়টা পড়ায় স্টেটসে আর ছুটোটা পড়ে অস্ট্রেলিয়ায়।

– ছুটোটি মাইয়া?

– হ।

– তবে আর কি– নেকু-পুসু-মুনু আর নাফিসার হানিমুন চলতাছে ক?

– হ। যা কইস।

– তারপর খইরুল বলল, তোর লাহিড়ীরে মনে আছে?

– কোন লাহিড়ী?

আরে পুলিশ সাহেবের ভাইগনা, বি সেকশনে আছিল। মুনসের যারে জুতোর শুকতলা বইল্যা ডাকত। মনে নাই?

হ। হ। পড়ছে মনে।

স্যা ন্যু ইয়র্কে সেটল করছিল। আটলান্টার বেঙ্গলি ফেস্টিভালে দেখা হইছিল। স্যা এহনে বিরাট বড়লোক। চারখান গাড়ি। একখান মার্সিডিস আর একখান বিএম ডাব্লু। তোর কথা খুব জিগাইতেছিল। তুই নাকি আজকাল লিখালিখিও করতাছস? তরে দিবার লইগ্যা একটা মোটা খাতা লাহিড়ী দিয়া দিছিল আমারে। খুব কইর‍্যা কইয়া দিছিল, তুই এই খাতাটা যদি কলকাতার কোন ভাল পাবলিশাররে দিয়া ছাপাইয়া দিবার পারস। ইটা ছাপান নাকি খুবই জরুরী।

খাতাটা কিসের তাতো কবি?

আমি জানুম ক্যামনে? তবে কইতাছিল অর সেকসুয়াল এক্সপেরিয়েন্সের কাহিনী।

সে আবার কি? হাইলি এক্সপ্লোসিভ ম্যাটেরিয়াল।

হ্যা ত তাইই কইল।

তুই পড়ছস?

ধুসস শালা। আমার সময় নাই। আর ছাপাইতেই যদি হইব তয় আমি আমার নিজের সত্য জীবনী ইনক্লুডিং সেক্স এক্সপিরিয়েন্সই ছাপাইমু। জুতার শুকতলার ক্যান? মজাটা হইল, অর এক্সপিরিয়েন্সের সিংহভাগই দ্যাশেই, সামান্যই নাকি বিদেশে। সবশুদ্ধ চার খণ্ড আছে।

চার ভলুম? কইস কি রে হালা!

তারপর বললাম, তুই ত আমার ঠিকানাও জানতস না, তা তুই কোন ভরসায় জিম্মাটা লইলি।

দূর হালা। আমি ত দ্যাশে আইসাই উটারে ছিঁইড়া ফ্যালাইয়া ব্লেন্ডার মেশিনে ভইরা দিতাম–। কিন্তু...

কিন্তু কি?

আমি আটলান্টা থিক্যা ফিরনের আগের দিন– আমি উঠছিলাম আমার কলেজের বন্ধু সাদিকের বাসায়– খবর প্যালাম যে জুতার শুকতলা, মানে লাহিড়ী নাকি আত্মহত্যা করছে। সব কাগজেই তার ছবি ছাইপ্যা দিছিল– Important Indian businessman bachelor hangs himself -Leaves Suicide note- এই ক্যাপশন দিয়া। তাইতেই আমার মন কইল, না যখন দিছেই জিনিসটা হালায়, ছুটবেলার দোস্ত, লইয়াই যাই। ক্রিমেটেরিয়ামে আমি যাইতে পারি নাই– ওর ঠিকানায় ফুল পাঠাইয়া দিছিলাম। দূরও বহত। কবরখানা হইলে কাছেই হইত কিন্তু হালায় যে হিন্দু, তারে যে পোড়াইবার লাগব। ফুলটা ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট হইয়া গেল। বাড়িতে থাকনের মতো ত কেউই আছিল না।

তারপর বলল, শোন নেকু-পুষু। তর ঠিকানা, ফোন নাম্বার, ফ্যাক্স নাম্বার, ই-মেইল নাম্বার সব আমারে এহনি ফ্যাক্স কইর‍্যা দে, এহনি। আমার সব নাম্বারই জ্যামখিন্দিকার জানে। আমি তরে কুরিয়ার কইর‍্যা জুতার শুকতলা লাহিড়ীর খাতাগুলান পাঠাইয়া দিতাছি কালই। যদি কোথাও ছাপাইতে পারিস ত ভালই হয়, আর না পারলে নিজেই পইড়্যা কি আছে সেগুলার মধ্যে তা জানাস।

তা ত করুম। কি আছে ত আমিও জানি না। পুলিশে ধরব না ত?

ছাড় ত! ইন্ডিয়া বাংলাদেশে মার্ডার কইর‍্যা, রেপ কইর‍্যা মানষে কলার তুইল্যা ডাঁটের মাথায় ঘুইর‍্যা বেড়াইতেছে-সব হালায় আর কিতাব লিখ্যা ছাপাইলে কে কি কইব? তাও যদি তর নিজের লিখা হইত।

জানি না। তাইলে ছাইড়তাছি ফোন। এদিকে আইলে আগেই ফ্যাক্স কি ই-মেইল কইর‍্যা দিস। ফোন কইরলে ত ভালই হয়। ভুলিস না য্যান। দেখা না করস যদি ত মাথা ফাটাইম্যু।

তারপরই মনে পড়াতে বললাম, যদি ছাপনের বন্দোবস্ত একটা কইরবার পারি তবে কপিরাইট কার নামে অইব? মানে রয়্যালটি পাইবডা কে?

হ। তাও কইয়া দিছে। অর্ধেক পাইব রংপুরের হিঁদুগো হরিসভা আর অর্ধেক পাইব বড় মসজিদ।

ওয়াকফ?

তা আমি জানি না। খাতার ফার্স্ট ভল্যুমের পরথমেই সেসব লিইখ্যা রাখছে সে। আমি একবার উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখছিলাম।

তাইলে ত পইড়াই ফেলাইছস।

আরে না। বই বরাইয়া যাউক তারপরেই পড়ব অনে আরাম কইর‍্যা।

আচ্ছা। থুইল্যাম ফোন। গুড নাইট। ভাল থাকিস।

হ। খোদা হাফিজ।

যেদিন আমেরিকা থেকে লাহিড়ীর লেখা চারটি মোটা মোটা খাতা কুরিয়ারে এসে পৌঁছল আমার কাছে সেদিন আমার অত্যন্তই কাজ ছিল। অত ভারী বইগুলো পাঠাতে কত টাকা লেগেছে কুরিয়ারের ফি হিসেবে খইরুলের কে জানে!

প্যাকেটটা খুলতে খুলতে সপ্তাহ শেষ হল। শনিবার আমার অফিস বন্ধ থাকে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমার স্টাডিতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে লাহিড়ীর খাতাগুলো খুললাম। প্রথমটা রেখে বাকিগুলো চেস্ট অফ-ড্রয়ারে চাবি-বন্ধ করে রাখলাম। তারপর প্রথম খাতাটি খুললাম। খুলেই চমকে গেলাম। লাহিড়ী ত স্কুলে

বাংলাতে আদৌ ভালো ছিল না কিন্তু এতদিন প্রবাসে থেকে বাংলাটা এমন লেখে, মানে আমার চেয়ে অনেকই ভালো, তা জেনে খুবই অবাক লাগল।

অনেকের প্রতিভাই এমন দেরি করে প্রস্ফুটিত হয়, যেমন খইরুলের প্রতিভা। তবে লাহিড়ীরা ছিল বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ– চলনবিলের কাছে পাবনাতে ওদের বাড়ি ছিল। ওরা জমিদার ছিল। ওর বাবা ও দাদাদের চেহারাও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ছিল– তীক্ষ্ণ নাসা, প্রশস্ত ললাট। ওর কাছে গল্প শুনেছি যে চলনবিলে প্রতি শীতে ওর বাবাদাদাদের নিয়ে পাখি শিকারে যেতেন। খুবই রবরবা ছিল সেই সব দিন। তারপর একবার সূর্যাস্তের মধ্যে খাজনা জমা দিতে না পারায় ওদের জমিদারি নিলামে ওঠে। ওদের যে শরিক লেঠেল দিয়ে খাজনা নিয়ে যাওয়া পালকি লুট করায়, তারাই পরে সে জমিদারি কিনে নেয়। হৃতগৌরব হয়ে, অর্থহীন হয়ে ওরা রংপুরে এসে ডেরা বাঁধেন।

বিপু লাহিড়ীর তখন সাত বছর বয়স যখন ওরা রংপুরে আসে। তারপর দেশভাগের পরে ১৯৫০-এ আবারও হৃতগৌরব ও হৃতঅর্থ হয়ে রংপুর ছেড়ে পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাটে চলে যায়। সবসুদ্ধু বছর পাঁচেক ওরা রংপুরে ছিল। নেকু অর্থাৎ আমিও প্রায় সেরকমই। আমরাও ১৯৫১-তে কলকাতাতে চলে আসি।

এসব কথা থাক। আমি বরং বিপু লাহিড়ীর ডাইরিটা পড়ি।

কানসাস সিটি

ইউএসএ, মে ১৯৭০

TO WHOM IT MAY CONCERN

আমি বিপু লাহিড়ী সাহস করে এই জীবনচরিতে যা লিখলাম তেমন করে বোধহয় আর কোনো বাঙালি তাঁদের জীবনচরিতে লেখেননি। আমি ত মহাপুরুষ বা ফরিস্তা নই। আমি অতি সাধারণ একজন মানুষ। রক্ত-মাংসর মানুষ। আমার শৈশব ও কৈশোরের অনেকখানি কেটেছে রংপুর ও বরিশালে। তারপর কলকাতাতে এবং তারও পরে গত ত্রিশ বছর ইউএসএ'র বিভিন্ন জায়গাতে।

জীবনের একটি বিশেষ দিক নিয়েই এই লেখা। আমার মনে হয় বাঙালি লেখকেরা ভীতু এবং ভণ্ডও। তাদের মধ্যে যারা আত্মজীবনীও লিখেছেন তারা অর্ধসত্য লিখেছেন নয়ত ভণ্ডামি করেছেন। সত্যি কথা সোজা করে কেউই লেখেননি।

আমরা ইংরেজিতে লেখা হলে সব লেখাই গোগ্রাসে গিলি। বিশেষ করে আজকাল। বাঙালিরা কম্প্যুটারের দৌলতে আজকাল আধা সাহেব পৃথিবীর সর্বত্রই। বাংলা ভাষায় লেখা বই তারা খুব কমই পড়েন এবং না পড়েই 'কিসস্যুই হচ্ছে না' এই সিদ্ধান্তে আসেন। যাচাই না করেই বাতিল করার এমন দৃষ্টান্ত বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এই অপার হীনম্মন্যতা বাঙালির সম্মান বাড়ায়নি।

সেই লরেন্স-এর লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার থেকে বালজার-এর নানা লেখা, হেনরি মিলারের টপিক অফ ক্যানসার, টপিক অফ ব্যন্ডিকর্ন, অধুনা এরিকা জং, মিলান ফুন্দেরা পড়ে আমরা পঞ্চমুখে প্রশংসা করি এবং সে সবের মধ্যে অশ্লীলতার চিহ্নমাত্রও দেখতে পাই না অথচ বাংলাতে জীবনপঞ্জী দু'লাইন লেখা হলেই ছিঃ ছিঃ করে উঠি।

জানি না এই ভণ্ডামি কবে আমাদের ছেড়ে যাবে। আমি এও জানি না, এই লেখা কোনো বাঙালি প্রকাশক ছাপতে রাজি হবেন কি-না। বাঙালি, সে হিন্দুই হোক কি মুসলমান, এখনও মনেপ্রাণে রক্ষণশীল– কি তারা রক্ষা করতে চাইছেন সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা না থাকা সত্ত্বেও। তাই আমার মনে হয়, আমার এই জীবনচরিত সাংঘাতিক বিস্ফোরক হিসেবে গণ্য হবে, বৈপ্লবিক হিসেবে গণ্য না হলেও। কেউ ছাপুন আর নাই ছাপুন যা আমি লিখেছি তার একটি শব্দও আমি কাটতে রাজি নই, ছাপা না হয় নাই-ই হলো।

পাঠক-পাঠিকারা আমার এই নির্লজ্জ কিন্তু সত্য স্বীকারোক্তি এর সততার জন্যই গ্রহণ করবেন এবং আমার অপরাধ নিজ গুণে মার্জনা করবেন– এই প্রার্থনা নিয়ে এই মুখবন্ধ আমি শেষ করলাম।

–বিপু লাহিড়ী। কানসাস সিটি, ইউএসএ।

এই ডাইরি লেখার কোনো দরকার ছিল না। সেই অর্থে সংসারে দরকারী বলতে কিইবা আছে? এমন জিনিস খুব কমই আছে যা না করলে পৃথিবীর কিছুমাত্র যেতে আসত।

আসলে গতকাল মিন্টু মামীর মৃত্যু সংবাদ পেলাম রন্টুর চিঠিতে। মিন্টু মামী আমার মায়ের পিসতুতো বোন। ওদের দেশ ছিল বগুড়াতে। বগুড়া যেহেতু রংপুরের কাছেই, মিন্টু মামী প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসত। বরেন্দ্র পরিবারে অশিক্ষিত কেউ থাকে না। মিন্টু মামীও পড়াশুনা করত। কিন্তু পড়াশুনাতে সে ভাল ছিল না তাই পরিবারে অপাঙক্তেয় ছিল। বরেন্দ্ররা সাধারণত খুব ফর্সা এবং সুন্দর দেখতে হয়। কালো বরেন্দ্রদের বদনাম আছে। লোকে বলে, কালা বামুন ডেঞ্জারাস। বরেন্দ্রদের এমনিতেই বদনাম আছে কোনো কোনো মহলে। সেটা ঈর্ষাজনিত কারণেও হতে পারে। পড়াশোতে ভালো হওয়াতে যেহেতু তারা ভালো ডাক্তার, মোক্তার, উকিল, অধ্যাপক ইত্যাদি হতেন, অন্যরা ঈর্ষায় তাদের বদনাম করত। তবে বরেন্দ্ররা আবার বলতেন, বদ্যিরা বরেন্দ্রদের চেয়েও ডেঞ্জারাস। রংপুরে সেন পাড়াতে ছিল বদ্যিদের বাস।

মিন্টু মামী বরেন্দ্র হয়েও দেখতে ভাল ছিল না। তার রঙ ছিল মাজা, চোখ-মুখও যে খুব একটা ভালো তা নয়, তবে তার মধ্যে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি ছিল। মিন্টু মামী আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় ছিল। দুপুরে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে ভাঁড়ার থেকে তেঁতুলের আচার চুরি করে মিন্টু মামী পিছনের গোয়ালঘরের পাশের চ্যাগারের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমার হাত ধরে ঘোঘটের ক্যানাল, আমাদের ছোট পুকুর, বাগানের পেছনের মস্ত আমলকি গাছের তলা দিয়ে বর্ষার বা শীতের দুপুরের উজ্জ্বল ক্লোরোফিল রোদ-ঠিকরানো গাঢ় সবুজ বনে ঘুরে বেড়াত। সাদা রঙের বুক ঢাকা জামা আর তাঁতের ডুরে শাড়ি পরত মিন্টু মামী। হাঁটলে অথবা উত্তেজিত হলে তার নাকের ডগা ঘেমে যেত। ছোট ছোট মুক্তোর মত ঘাম জমত তার নাকের উপরে। কানের লতি দিয়ে সুগন্ধি ঘাম গড়িয়ে পড়ত। তখন তাকে খুব সুন্দর দেখতাম আমি।

কখনও কখনও আমাদের বাড়ির পোষা কুকুর কালো সঙ্গে থাকত। যখন আমি একা বেড়াতাম দুপুরের এই বাধাহীন অবকাশে নিজের সব ইচ্ছেকে বগারি পাখির ঝাঁকের মত উড়িয়ে দিয়ে, তখন কখনও কালোকে কোলবালিশ করে আমলকি গাছের তলাতে ঘুমোতাম। বিশেষ করে শীতের দিকে।

মিন্টু মামী আমাকে খুব ভালোবাসত। কেন, তা আমি বলতে পারব না। মিন্টু মামীও এ সম্বন্ধে কথা বলত না। কিন্তু আমার দিকে চাইলে মিন্টু মামীর দু'টি চোখ কাঁচপোকার মত স্পন্দিত হত আর তখন আমার খুব ভয় করত। এক দুপুরে আমরা হরিসভার পুকুরপাড়ের ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলাম। সেখানে একটা মস্ত দারাজ সাপ থাকত– নানা রঙে রঙিন। সেই সাপটা শীতের দুপুরে পূজোর পরে প্রতিমা ভাসান দেয়া কলাগাছের ভেলার উপরে বসে সাঁতার কেটে এসে উঠে টানটান শুয়ে থাকত। হলুদ রঙা প্রজাপতি উড়ত তার গায়ের উপরে, মাছরাঙ্গা পাখি বসে থাকত জারুল গাছের ডালে আর মাঝে মাঝে ছোঁ মারত জলে। পুকুরপাড়ের মধুকুলের বনের উপরে মৌমাছি উড়ে উড়ে মধু খেত। আমরাও খেতাম সে মধু মাঝে মাঝে।

সেই সব দুপুরে কি যে শান্তি ছিল তা কি বলব। এই আমেরিকাতে ত নয়ই, আমাদের দেশেও কোন শহরে এমন শান্তির কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না। সেই শান্তি হারিয়ে গেছে হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে। এখন সব জায়গাতেই মানুষ শুধু মানুষ। মানুষ নিজে হাতে নিজেদের যে এমন সর্বনাশ করল, সর্বনাশ সম্পূর্ণ করল তা দেখে বড় ব্যথিত হই। মানুষের সংখ্যা এশিয়ার সব দেশেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আমরা যদি যে করে হোক নিয়ন্ত্রণ না করতে পারি তাহলে এই সব পশ্চিমী দেশের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য কোনোদিনও আমাদের করায়ত্ত হবে না। এ কথা যত তাড়াতাড়ি আমরা বুঝি ততই ভাল।

কিন্তু এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে কোনো দেশের কোনো রাজনৈতিক দলেরই কোনো নজর নেই। মানুষ যত বাড়ে, অশিক্ষিত, অভুক্ত, বস্ত্রহীন মানুষ যত বাড়ে, ততই ত নেতাদের মঙ্গল। পঙ্কেই ত পদ্ম ফুল ফোটে। যত বেশি মানুষ তত বেশি কনস্টিট্যুয়েন্সি, তত বেশি এমএলএ, তত বেশি এমপি, তত বেশি ক্ষমতা। এই নেতারা সকলেই তলে তলে দেশদ্রোহী, নইলে দেশের এত বড় সর্বনাশের যজ্ঞে তারা শামিল হতেন না। এই নেতারাই পাপী, টেরোরিস্টরা নয়।

এখন যে সব দেশেই সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে তার মূল কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য। মুষ্টিমেয় মানুষ

পরম ফুর্তিতে দিন কাটাবে আর কিছু মানুষ দু' বেলা ভরপেট খেতে পাবে না– এই বৈষম্য চোখের সামনে আর কতদিন সহ্য করবে মানুষ। আমার বয়স হয়েছে। ষাট ছুঁই ছুঁইতে এসে বিপ্লবী হওয়া যায় না, গেলে আমি নিজেই সন্ত্রাসবাদী হয়ে রাইফেল তুলে নিতাম হাতে। যারাই দেশের কথা ভাবে, দশের কথা ভাবে, তাদেরই ঘুম হয় না রাতে। সব ফুলকেই তাদের কন্টক শয্যা বলে মনে হয়।

কিন্তু কি করা যাবে।

বলতে বসেছিলাম এক কথা আর এসে গেল অন্য প্রসঙ্গ। অথচ দেশের প্রসঙ্গ এখনও প্রত্যেক শিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষের মনে না এলে আর কবে আসবে?

প্রথম যখন অ্যামেরিকাতে আসি, আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে, তখন একদিন একটি পাউরুটির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে যখন দেখলাম নব্বই রকমের রুটি বিক্রি হচ্ছে সেখানে, তখন দু' চোখে জল এসেছিল। আমার দেশের কোটি কোটি মানুষের কপালে দু' বেলা রুটিই জোটে না আর এরা কিভাবে বাঁচে। এদের ঈর্ষা করে আমরা বড় হতে পারব না বরং এদের দৃষ্টান্তে আমাদের অনুপ্রাণিত হতে হবে। আত্মসম্মান জ্ঞান, সততা, কর্তব্য জ্ঞান, নিয়মানুবর্তিতা, কর্মক্ষমতা, প্রশাসনে, ওদের দেশের মতন সব রকম প্রশাসনে স্বচ্ছতা যেদিন আমাদের দেশে আসবে সেদিন আমরাও মানুষের মতো বাঁচতে পারব।

মিন্টু মামীর প্রসঙ্গের সঙ্গে এই সব প্রসঙ্গ কেন জড়িয়ে গেল তা আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। মিন্টু মামী বগুড়া থেকে রংপুরে যে এত ঘন ঘন আসত, সে যে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছিল তার পেছনে ছিল অর্থনৈতিক কারণ। মিন্টু মামীর বাবা মনাদাদু ছিলেন স্কুলের ইংরেজির মাস্টার। অমন ভাল ইংরেজি হয়তো সাহেবরাও জানতো না। একবার রংপুরে গরমের ছুটির সময়ে এসে আমাকে আমার বাবার অনুরোধে ইংরেজি পড়িয়েছিলেন। কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ারে ব্যাঙের মতো বসে নস্যি নিতে নিতে নেসফিল্ড সাহেবের গ্রামার থেকে এ্যাপ্রোপিয়েট প্রিপ্রজিশান চ্যাপ্টারটি এমন করে পড়িয়েছিলেন যে, জীবনে ভুলব না। ইংরেজি THE শব্দের উচ্চারণ যে ভাওলের আগে থাকলে 'দি' হয় আর কনসোনেন্ট-এর আগে থাকলে 'দ্যা' হয়- এ কথা অনেক ব্যাটা সাহেবও জানে না, দিশীদের কথা বাদই দিলাম। আজকাল কমপ্যুটার আসায় ত সকলেই ইংরেজী বিশারদ হয়ে গেছে কিন্তু সারা পৃথিবীতেই শুদ্ধ ইংরেজি বিসর্জিত হয়েছে।

মনাদাদু স্বদেশী করতেন। টেররিস্ট ছিলেন। মাঝে মাঝে কলকাতা গিয়ে সেখান থেকে নানা কয়লা খাদানে গিয়ে ডিনামাইট সংগ্রহ করে আনতেন। তার কাছে আমি রিভলবারও দেখেছি। ইংরেজ পুলিশের দিশী টিকটিকিরা তার খোঁজ রাখতো। একটা সময়ে দু'রাত তিনি এক জায়গাতে কাটাতেন না। পুলিশের টিকটিকির চোখে ধুলো দেবার জন্য অমন জীবন যাপন করতেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। নীলফামারি শহরের দাসেদের তেলকলে এক রাতে পুলিশ তাকে পুরো তেলকল ঘিরে ধরে ফেলে। তাকে নিয়ে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে জেরা করে তার দলের অন্যদের খবর বের করতো পুলিশ, তা তিনি জানতেন। তাই তার রিভলবারের দুটি গুলিতে তিনি দারোগাশুদ্ধ ছ'জন পুলিশকে কুত্তার বাচ্চা কুত্তার বাচ্চা বলতে বলতে মেরে নিজে পঁচিশটা গুলিতে বিদ্ধ হয়ে মারা যান ঐ তেলকলের মধ্যেই। মারা যাওয়ার সময়ও তার মুখে ছিল 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি। সেই সময়ে মনাদাদুর মতো আরও কত মানুষ ঐভাবে মারা গেছিলেন। আন্দামানের সেলুলার জেলে গিয়ে দাঁড়ালে বন্দিদের যে দীর্ঘ তালিকা আছে তা থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ কয়েদিই বাঙালি ছিলেন। কি দুঃসহ অত্যাচার তাদের সইতে হয়েছিল তা জানা যায় রাতের 'সন এত ল্যুমিয়ের'টি দেখলে।

আজকে যখন ভারতবর্ষে কি বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতারা দেশের ভাগ্য, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন তখন আমার মনাদাদুদের কথা মনে হয়। যারা সব রকম মূল্য দিয়ে এই স্বাধীনতা আনলেন তাদের কথা কে মনে রেখেছে? নেপোতে দই মারছে। চরকা কেটে আর ছাগলের দুধ খেয়েত স্বাধীনতা আসেনি, এসেছিল মনাদাদুদের ভয়ে। শক্তর ভক্ত সবাই। সত্যিই সব ক্ষমতার উৎস বন্দুকের নলই– এখনও– কারণ গণতন্ত্র এখনও একটা প্রহসনই রয়ে গেছে। গণতন্ত্রও পরিচালিত হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রিগিং, বন্দুকের নল এবং টাকার থলে দ্বারা। যেখানে গরু-ছাগলের মতো এমএলএ আর এমপি কেনাবেচা হয়, যেখানে সংসদে সংসদ সদস্যরা জানোয়ারের মতো ব্যবহার করেন, সেখানে গণতন্ত্র প্রহসন ছাড়া আর কি? এই মহাদেশের

সর্বত্র গরীব আরও গরীব হয়েছে আর বড়লোক আরও বড়লোক। আমরা জানি সব, বুঝি সব, কিন্তু দেখেও কিছু দেখি না, শুনেও শুনি না, যতদিন না এই আগুনের আঁচ আমাদের নিজেদের গায়ে লাগছে, যতদিন না আমাদের পায়ে কেউ পাড়া বা মাড়া দিচ্ছে ততদিন আমাদের টনক নড়বেও না। কিন্তু এখনও যারা এই মেঘমন্দ্র সুর শুনতে না পারছে, বুঝতে না পারছে দূরাগত তুমুল জলোচ্ছ্বাসের শব্দ তারা তাদের মৃত্যুর পথই সুগম করছে। মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী ও স্বার্থপর এবং বদমতলবী মানুষেরাই এই সারা উপমহাদেশে সন্ত্রাসবাদের জনক। আসল সমস্যাটা যে অর্থনীতির, জনসংখ্যার, তা ইচ্ছে করে ভুলে থেকে মৌলবাদ এবং নানা পথে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। জাত-পাত-এর বিভেদ বা মৌলবাদের কুয়াশা যে কোনো দেশের মানুষকেই সুখের মুখ দেখাবে না, শান্তিতে বাঁচতে দেবে না- এ কথা যারা বুঝেও এখনও বুঝছেন না তাদের গুলি করে এখুনি মারা উচিত এই উপমহাদেশের প্রত্যেক আনাচে-কানাচে। নিজেদের গদি বাঁচানোর জন্য এরা ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বিবাদ চিরস্থায়ী করছেন। ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বিবাদ মিটে গেলে তারা ঘোলা পানিতে মাছ ধরবেন কি করে?

মিন্টু মামীর মা আমার মায়ের দূরসম্পর্কের পিসী মারা গেছিলেন তার ছেলেবেলায়। কোনো ভাই-বোন ছিল না মিন্টু মামীর। মনাদাদুর মৃত্যুর পরে তার দু' ভাইয়ের যৌথ পরিবারে মিন্টু মামীর স্থান সংকুলান হতো না। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে তাকে 'ভ্যানমাস্টারি' করতে হতো। অথচ মিন্টু মামী পড়াশোনাতে বেশ ভাল ছিল। এ দাসত্বের জীবনে হাঁফিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝেই পালিয়ে আসতো সে রংপুরে। আমাদেরও যৌথ পরিবার ছিল। মায়ের ও বাবারও ইচ্ছে থাকলেও পরিবারের অন্যরা বিশেষ উৎসাহ না দেখানোতে মিন্টু মামী আমাদের কাছে পাকাপাকিভাবে থাকতে পারত না।

তোর জামাও খোল– আমিও সব খুলছি।

বলেই আমাকে আতঙ্কিত করে নিজের শাড়ি-সায়া-জামা সব খুলে ফেলল। তার দু’ উরুর মধ্যে এক বিভাজিকা, তাতে নরম পাটের মতো কালো চুল– দুই বগলতলিতেও তাই। আমি বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলাম সেই শায়িত উদ্ভিন্নযৌবনার নগ্নতার দিকে। দুটো কুরো পাখি ডাকছিল জঙ্গলের গভীর থেকে। একটার ডাকে অন্যটা সাড়া দেয় গুব গুব গুব গুব গুব গুব করে। চোতরার জঙ্গলের উপরে হলুদ প্রজাপতির ঝাঁক উড়ছিল, হাঁড়িচাঁচা ডাকছিল একটা কর্কশ শব্দ করে। মিন্টু মামী আমার ওটাকে দু’হাতে আদর করে ধরে তার দু’পায়ের মধ্যের নরম সুগন্ধি পাট ক্ষেতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। দিয়ে নিজেই নিজের কোমর উঠাতে-নামাতে লাগল। ভাল লাগায় আমার কান্না পেয়ে গেল। সমস্ত শরীরটা কান্নাকাটি করতে লাগল। মনে হল, বংশী, যে আমার সাইকেলটা চুরি করেছিল বলে আমি নিশ্চিত জানি, তাকে ক্ষমা করে দিই। ইতিহাসের মকবুল স্যার, যিনি আমাকে কান ডলে ডলে আমার কান প্রায় ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করেছিলেন এবং যাকে একদিন আমি আর খইরুল মিলে মুখে মুখোশ পরে সন্ধ্যের মুখে ধরে ঝিকার বস্তাতে পুরে ঝিকার ডাল দিয়ে পিটিয়ে দোজখে পাঠাব বলে ঠিক করেছিলাম, তাকেও ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে হল। আমার তখন এত আনন্দ, ঈসরে। সে কি আনন্দ!

মিন্টু মামীর শরীর গরম হয়ে গেছিল। দু’চোখের মণিতে যে সাদা অংশ থাকে সেই অংশ দুটো লাল হয়ে গেল রক্ত গিয়ে।

আমি ভয় পেয়ে বললাম, মামী তোমার চোখ লাল হয়ে গেছে। মামী বলল, হয়। তুই থামলি কেন? তুই কি বুড়ো হয়ে গেছিস নাকি?

আমি বললাম, আমি ফুরিয়ে গেছি।

মামী বলল, দাঁড়া তোরে জাগাই আমি।

বলেই উঠে পড়ে আমার দুই উরুর মধ্যে মুখ নামিয়ে খুব জোরে আমার ওটা চুষতে লাগল। আর দেখতে দেখতে আবার আমি শক্ত হয়ে গেলাম।

মিন্টু মামী বলল, মরদের বাচ্চা, মরদের বাচ্চা। আয় আবার মধ্যে আয়।

আবার সেই একই প্রক্রিয়া।

সেবার যখন শেষ হলো তখন আরামে-আবেশে আমি আর মিন্টু মামী দু’জনেই দু’জনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম মনে নেই। চোখ খুলে দেখি বেলা পড়ে এসেছে। আর দুটো শেয়াল কাছ থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ভেবেছে, আমরা বুঝি মরে গেছি।

মিন্টু মামী বলল, দূর হ, দূর হ, মরারা।

তারপর বলল, চল যাই। ভাল করে চান করতে হবে। রাতে আবার তোর ছোট কাকা ঢুকবে এসে আমার ঘরে। আমার ঘরটা ত স্থলযান– বারান্দার উপরে বেড়া দেয়া ঘর। ধাক্কাধাক্কি করলে পাছে শব্দ হয় তাই আমি খুলেই রাখি। তবে তোর ছোট কাকাটা নিকম্মা। তিন মিনিটেই শেষ। কোনো কোনোদিন ভিতরে আসার আগেই তার হয়ে যায়। সে বিয়ে করলে বউ তাকে ছেড়ে চলে যাবে।

তারপর শাড়ি পড়তে পড়তে বলল, সিসটেমটা ভালই। সকালে আমার হাতের ফেনা ভাত-ঘি আর ডিম সেদ্ধ-পটল সেদ্ধ দিয়ে না খেলে তার চলে না আর রাতে আমাকেই ফেনা ভাত করতে আসে। এলে কি হয়। তার ডিম দুটোও যেমন পটলও তেমনি।

তারপরই হেসে বলল, বল হরি হরিবোল, একটা লম্বা দুটো গোল।

আমি উদ্বিগ্ন গলাতে বললাম, আমার প্যান্টটা ভিজে গেছে।

যাবেই ত। আনন্দের অশ্রুতে ভিজেছে।

তারপরই বলল, তুই এক কাজ কর পুকুরে গিয়ে কোমর অবধি ডুবে আয়। বাড়িতে কেউ জিগগেস করলে বলবি হরিসভার পুকুরের পাশের কদম গাছ থেকে কদম পাড়তে গিয়ে পুকুরে পড়ে গেছিস। গিয়েই কিন্তু প্যান্টটা নিজে হাতে ধুয়ে ফেলবি ভাল করে। দেখবি ফেনা বেরোবে। ভাল করে ধুয়ে অন্য প্যান্ট পরবি।

আর তুমি?

বাইরে থেকে আমাদের কিছু বোঝা যায় না। আমি গিয়ে ভাল করে চান করব। সায়াতে একটু আধটু লেগে থাকবে তোর দান বা দাদন যাই বল। সে কাল চান করার সময় দেখা যাবে। রাতে ত আবার তোর চড়াই পাখি ছোট কাকা আসবে। তবে সে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। একটা যাচ্ছেতাই! কিন্তু বড় ভয় করে রে। দিদি জামাইবাবু যদি কখনও জানতে পায় তাহলে এখানে আসাই আমার বন্ধ হয়ে যাবে। নীলফামারীতেও কি কম বিপদ। যাক সে সব কথা। পুরুষগুলো বড় হ্যাংলা– কচুবনের শুয়োরের মতো। তোকে আমি এমন ট্রেনিং দেব যে দেখবি তোর বউকে সাত চড় মারলেও সে তোকে ছেড়ে যাবে না।

তারপরই বলল, তোর বন্ধু খইরুলের কি খবর রে?

ভালই আছে।

ওকে একদিন নিয়ে আসিস ত। ওরা ত মুসলমান। ওদের কাটা থাকে বলে শুনেছি ওরা অনেকক্ষণ করতে পারে। মুসলমান মেয়েদের কি মজা!

তারপরই বলল, আনবি একদিন। আমি কোনো মুসলমানের সঙ্গে কখনও করিনি।

আমি উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকলাম।

মিন্টু মামী বলল, জলের মধ্যে করতে খুব মজা। সামনেই পূর্ণিমা। তোদের বাড়ির পেছনের পুকুরে তোর সঙ্গে করব রাতের বেলা। চারদিকে হাজার হাজার চাঁদের সাপ কিলবিল করবে আর তোর সাপটা হিল হিল করতে করতে ঢুকবে আমার দু' উরুর মধ্যে। ভাল লাগাতে মরেই যাব।

সেই অভিজ্ঞতা আমার আর হয়নি। আমার জীবনের প্রথম শয্যাসঙ্গিনী তার দু'দিন বাদেই চিতি সাপের কামড়ে মারা যায়। ওঝা-ফকির কিছুই করতে পারেনি। বড় ঘরের নিচের সিঁড়িতে বসে উঠোনে পা রেখে সে মেজ কাকিমার সঙ্গে গল্প করছিল সন্ধ্যেবেলায়, হাসনুহানা ফুলের গন্ধের মধ্যে আর তখনি চিতি সাপে কামড়ে দেয় মিন্টু মামীকে। নানা সাধ ছিল অভাগীর বুকে, সেই সব সাধের প্রায় কিছুই পূরণ হতো না সে বেঁচে থাকলে। গেছে ভালই হয়েছে।

মনাদাদুর মতো সাত্তিক চরিত্রের আদর্শবাদী মানুষের মেয়ে যে কি করে এমন ডাকিনী স্বভাবের হলো কে জানে!

তবে যতদিন বাঁচব আমার ওই প্রথম শিক্ষিকাকে মনে রাখবো ভক্তি ভরে।

মিন্টু মামীকে আমরা পরদিন সকালে শংকামারীর শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করলাম। রংপুরে আমাদের বাড়ি এবং শংকামারীর শ্মশান যেখানে ছিল সেখানে নাকি এয়ারপোর্ট হয়েছে বলে শুনেছি এখন।

শংকামারীর শ্মশানে ছোট কাকু খুব কেঁদেছিল। বাবা ও জ্যাঠা একটু অবাক চোখে চেয়েছিলেন ছোট কাকুর দিকে। আমিও কেঁদেছিলাম। বাবা ও জ্যাঠা ভেবেছিলেন, আমি ত কাঁদবই। কারণ আমি যে মিন্টু মামীর খেলার সাথী ছিলাম!

বরিশালে যখন বাবা বদলি হয়ে চলে এলেন তখন আমরাও এলাম। বরিশাল জিলা স্কুলে ভর্তি হলাম ১৯৪৬-এর গোড়াতে। তখন দেশভাগের আলোচনাতে সব জায়গা সরগরম ছিল। আমার এক বন্ধু মঞ্জুরুল করিম মুহম্মদ ইকবালের গানের কথা বদলে গাইত 'সারে জাঁহামে আচ্ছা পাকিস্তাঁ হামারা'।

আমরা থাকতাম জর্ডন কোয়ার্টারে। কীর্তনখোলা নদীর উপরের স্টিমার ঘাট কাছেই ছিল। রাতের বেলা গোয়ালন্দ, ঢাকা, খুলনা সব জায়গা থেকে স্টিমার আসত-যেত। তাদের শব্দহীন তীব্র সার্চলাইটের আলো

জর্ডন কোয়ার্টারের ঘুমন্ত বাড়িগুলোর আনাচ-কানাচ ভরে দিয়েই সরে যেত পলাতক চোরের মতো।

আমার মায়ের এক আত্মীয়া থাকতেন আমানতগঞ্জে– ইলেকট্রিসিটির অফিস ছাড়িয়ে। নদীর পারে মস্ত দোতলা বাড়ি। রান্নাঘর ছিল নিচে একটু দূরে। রান্নাঘরের কাছেই পুকুর ছিল। সেই পুকুরের সঙ্গে যোগ ছিল নদীর। জোয়ারের সময়ে নানা মাছ এমনকি কুমিরের বাচ্চাও চলে আসত। বড় বড় চিংড়ি মাছও আসত।

তখন ডাকাতের খুব ভয় ছিল। রাতে কোনো প্রাকৃতিক প্রয়োজনেও কেউ বাইরে বেরোত না ঘরের। ঘরের মধ্যেই ঝকঝকে করে মাজা পেতলের বড় বড় ডাবর থাকত।

একটা সময়ে আমরা আমানতগঞ্জেও ছিলাম দক্ষিণা ঘোষের বাড়ির এক তলাতে। দক্ষিণা ঘোষের মেয়ে পতু ঘোষ কলকাতার সিনেমা আর্টিস্ট ছিলেন। দক্ষিণা ঘোষের বাড়ির কাছেই মস্ত এক দীঘি ছিল।

কিছুদিন আমরা কাঠপট্টিতেও ছিলাম। সাহাদের নতুন বানানো বাড়িতে। বরিশালের মতো বিচিত্র জায়গা বোধ হয় পৃথিবীতেই নেই। পথের নর্দমাতেও জোয়ার-ভাটা চলত। জোয়ারে জল বাড়ত আর ভাটাতে জল কমত।

মায়ের আত্মীয়া সুমনা মাসীর বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতাম। যখন আমানতগঞ্জে থাকতাম তখন পাঁচ মাইল হেঁটে স্কুলে আসতে ও ফিরতে হত। সাইকেল-রিকশা ছিল কিন্তু অত পয়সা ছিল না বাবার যে, রোজ সাইকেল-রিকশা করে যাওয়া-আসা করি। বাবা সাইকেলে করে যাওয়া-আসা করতেন।

সুমনা মাসীর পাশের বাড়ি ছিল ফুল্লরাদের। তারা ছিল পাঁচ বোন। সকলেই পরমা সুন্দরী। সুমনা মাসীর মেয়ে যুঁথীর সঙ্গে ওদের খুব ভাব ছিল। তৃতীয় মেয়েটির নাম ছিল জবা। তারা সকলেই ছুটির দিনে সুমনা মাসীদের পুকুরে সাঁতার কাটতে আসত। জবাও রংপুরের নাফিসার মতো নকশীকাঁথা বুনত জলের মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে। অতজন মেয়ের মধ্যে আমিই ছিলাম একমাত্র পুরুষ। ওরা সবাই, জবাশুদ্ধু আমাকে নিয়ে কচলাকচলি করত।

সুমনা মাসীর বাড়ির ডানদিকে ছিল দোলা মতো অনেকখানি জায়গা। তাতে কোথাও কোথাও জল ছিল। ডাহুক হেঁটে বেড়াত জলের ধারে ধারে। হিজল গাছ ছিল অনেকগুলো, যুঁই, চাঁপা আর ছিল চাপ চাপ দুব্রা ঘাসের জমি। জায়গাটা গাছগাছালির জন্যে ছায়াচ্ছন্ন ছিল। নানা ফুলের গন্ধে ভরা ঐ জায়গাটাতে এলেই মনটা উদাস উদাস করত।

মেয়েরা যখন আমাকে নিয়ে কচলাকচলি করত তখন তারা জানত না যে, মিন্টু মামী আমাকে সেই খেলাটা খেলতে শিখিয়ে দিয়েছে। ওরা আমাকে যত ছোট এবং অপাপবিদ্ধ ভাবত তা আমি ছিলাম না। আমার গায়ের রঙ ছিল আগুনের মতো এবং মুখও সুন্দরই ছিল। বয়স অনুপাতে আমি লম্বাও ছিলাম। কীর্তনখোলা নদীর পাড়ের অফিসার্স ক্লাবে আমি ছোট র‍্যাকেট নিয়ে টেনিস খেলতাম স্কুলের পরে সপ্তাহে তিন দিন। যে কারণেই হোক বড়-ছোট সব মেয়েই আমাকে পছন্দ করত। মায়ের কাছ থেকে রবীন্দ্র সংগীত ছাড়াও নানা ধরনের গানও শিখেছিলাম আমি। অনেকেই বলত ভাল গান গাই। স্কুলের ক্রিশ্চান হেডমাস্টার মশাইও আমাকে দিয়ে প্রাইজ ডিস্ট্রিব্যুশনের দিন গান গাইয়েছিলেন।

সাঁতার কাটতে কাটতে একদিন জীবার জামার বুকের বোতাম ছিঁড়ে গেল। ভেতরে কোনো জামা ছিল না। দুটি কচি বাতাবী লেবুর মতো বুক উদ্বেল হয়ে উঠল। হঠাৎ করে অমার রংপুরের পুকুরপাড়ের মিন্টু মামীর স্মৃতি জাগুরুক হলো এবং হতেই আমি এক তীব্র কামভাবে তাড়িত হলাম। ডুব-সাঁতার কেটে জবার পা ধরে উঠে আমি জলের তলাতে নামিয়ে আনলাম এবং ওর জাম্বুরার মতো বুকের একটিতে হাত দিয়ে মর্দন করে অন্যটিকে চুষে খেতে লাগলাম। জবা ছটফট করে উঠল। কিন্তু মাছের চেয়েও ভাল সাঁতার কাটত ও। একটু পরে দু'জনেই উঠে দেখি জবার অন্য বোনেরা সুমনা মাসীর মেয়ের সঙ্গে পাড়ে উঠেছে।

জবা মিন্টু মামীরই মতো অভিজ্ঞ কিনা বুঝলাম না কিন্তু হাত দিয়ে চোখের উপরের ভিজে চুল সরাতে সরাতে ও বলল, কাল ওরা সবাই সিনেমা দেখতে যাবে। আমার মা ও সুমনা মামীও যাবে। আমি পেটে ব্যথা করছে বলে যাব না। তুমি এসো।

কখন?

ওরা ম্যাটিনি শোতে যাবে। তুমি সাড়ে তিনটাতে এসো।

কোথায়? তোমাদের বাড়িতে?

না, না। মোক্ষদাদিটা ভারি সেয়ানা। বাড়িতে নয়। তুমি ওই ডাহুক ডাকা দোলাতে এসো। এক ঘন্টা থেকে চলে যেও।

মেসো থাকবে না তখন বাড়িতে? কাল যে সব ছুটি।

না, না। মেসো আর অলকার বাবাও ত যাবেন নইলে অতজন মেয়েকে কি একা ছেড়ে দেবেন? দিনকাল যেমন অশান্ত হয়ে উঠেছে দেখছো না? পাকিস্তান হবার আনন্দে মুসলমানেরা সকলেই উল্লসিত। হিন্দুদের ভয়ও দেখাচ্ছে অনেকে। যার বাড়ি এতগুলো সুন্দরী মেয়ে তাদের ভয়ও বেশি।

ঠিক আছে। মাকে মিথ্যা কথা বলে আসব।

আহা মিথ্যা যেন কখনও বলনি। আমার জন্য বললেই না হয় একটা মিথ্যা। তুমি কিন্তু আমাদের বাড়িতে আসবেই না, আসলেই মোক্ষদা দিদি সব আন্দাজ করে নেবে। সে যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখনই আমি বেরিয়ে আসব। তুমি যদি আগে এসে যাও ত আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

বেশ।

ঠিক সময় মতো এসে সেই ডাহুক ডাকা দোলাতে পৌঁছে দেখি জবা একটা শতরঞ্জি বিছিয়ে ঘাসের উপরে বসে আছে। তার কাছেই এক জোড়া ডাহুক ডুক ডুক শব্দ করে গুটি গুটি পা ফেলে হেঁটে বেড়াচ্ছে। দূরে নদীটা দেখা যাচ্ছে। পাল তুলে নৌকা যাচ্ছে নদী বেয়ে।

আমি গিয়ে পৌঁছতেই জবা আমাকে চুমুতে চুমুতে ভরে দিল। তার মাথার সুগন্ধী নারকেল তেলের গন্ধে আমার নাক ভরে গেল।

বললাম, শতরঞ্জি নিয়ে ফিরলে তোমার মোক্ষদা দিদি কি বলবে?

এটা নিয়ে ফিরব না। এটা গতকালই সুমনা মাসীর বাড়িতে রেখে গেছিলাম।

এটা পেতে আমরা কাল পুকুর ঘাটে বসে অন্ত্যক্ষরী খেলছিলাম। তারপর ইচ্ছে করে রেখে গেছিলাম।

বাঃ বাঃ কি বুদ্ধি তোমার!

ও উত্তর না দিয়ে বলল, এসো বিপু।

সব মেয়ের বুদ্ধিই কিন্তু এরকম তীক্ষ্ণ। বুদ্ধিতে যে কোনো মেয়ে যে কোনো পুরুষকে যে কোনো সময়ে হারাতে পারে।

জবা ওর জাঙ্গিয়াটা খুলে পাশে রাখল। তারপর জামাটা না খুলে উপরে তুলে গলার কাছে তুলে রাখল।

কি দারুণ ফর্সা জবা। আর এই ডাহুক চরা দোলারই মতো চাপ চাপ কালো ঘাস তার উরুসন্ধিতে। আমি নাক ডুবিয়ে চুমু খেলাম। ও শৃঙ্গার করে উর্ধ্বে দু'হাতে আমাকে টেনে নিয়ে চুল লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে আমার ঠোঁটে ভীষণ কামড় দিয়ে আমার ঠোঁট দুটো শুষে নিতে লাগল। আমি ওর দু' বুকের মধ্যে ওর ঠোঁট থেকে মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে মুখটা চেপে ধরলাম তারপর মিন্টু মামী যেমন করে শিখিয়েছিল তেমন করে ওর বুক খেলাম। ও আনন্দে উঃ উঃ করে উঠল।

তারপর আমি আমার ওটিকে বের করে বললাম, এবারে তুমি খাও।

খাব? ওটা? মরে গেলেও পারব না।

বললাম, খেয়েই দেখ আইসক্রিমের মতো। তারপর দেখ তোমাকে কেমন আদর করি।

ও আপত্তি করেও খেল। খেতে লাগল আর আমি ছোট থেকে ক্রমশ বড় ও দৃঢ় হতে লাগলাম। তারপর মাখনের ডেলার উপরে ছুরি চালাবার মতো জবার বিভাজিকার মধ্যে নিজেকে প্রবেশ করালাম। জবা হঠাৎ চমকে উঠে আনন্দে কঁকিয়ে উঠল। তারপর ও ক্রমশ গভীর আনন্দের গভীরতর উপত্যকায় ডুবে যেতে লাগল।

আমার আবার মনে হল আমার শরীরটা কান্নাকাটা করছে, মনে হল আমার সঙ্গে যে যত খারাপ ব্যবহার করেছে তাদের সকলকে ক্ষমা করে দেই। আমার এই আনন্দঘন মুহূর্তে পৃথিবীর কারো বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ, কোনো রাগ পুষে রাখব না।

জবা তার উরু দুটিকে আন্দোলিত করছিল আর নিজের আনন্দে নিজেই রোমাঞ্চিত হচ্ছিল।

দু'জনেরই চরম পুলকের পরে আমি ওর বুকের উপরে অনেকক্ষণ পড়ে থাকলাম। দু'জনেরই নিঃশ্বাস যখন স্বাভাবিক হয়ে এলো, আমি বললাম, তুমি আগে করেছো?

ও মাথা নাড়ল দু'দিকে। আমি বুঝতে পারলাম যে, ও মিথ্যা কথা বলছে।

তুমি?

হ্যাঁ।

তখন ও বলল, আমিও। মাত্র একবার।

কার সঙ্গে?

মকবুল। আমাদের পাশের বাড়ির। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। তবে আমাকে মুসলমান হতে হবে ওকে বিয়ে করতে হলে। বাবা ত রাজি হবে না। আমারও ইচ্ছা নেই। তাই ঠিক করেছি আমরা পালিয়ে যাব।

কোথায় যাবে?

ঠিক নেই। হয়তো ভোলাতে যাব, নয়তো নারাণগঞ্জে।

সবাইকে ছেড়ে এমন করে চলে যাবে? বাবা-মা দুঃখ পাবেন।

জীবনে সুখী হতে হলে অন্যকে দুখী করতেই হয়। এর চেয়ে বড় সত্য নেই। তবে বাবা-মা কি ফেলতে পারবেন। পরে সবই মেনে নেবেন। আমি আমার মা-বাবার কথা জানি। মকবুলের মা-বাবার কথা জানি না। মকবুলের বাবা রমজান চাচা কট্টর মুসলমান। দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন।

বিয়ে যখন মকবুলকে করবে তখন আমার সঙ্গে এসব করলে কেন? গুনাহ হবে না?

গুনাহ কিসের? পাপ-পুণ্য সব মনের ব্যাপার। এতো একটা খেলা, মজার খেলা, আনন্দের খেলা, তোমাকে আমার সন্তানের বাবা করছি না। খেলাধুলা করলে শরীর এবং মন ভাল থাকে। বুঝছো বোকা ছাওয়াল?

কানসাস সিটি দক্ষিণ আমেরিকাতে। তুলোর জায়গা। কালোদের জায়গা। আঙ্কল টম'স কেবিনের পটভূমি এই এলাকা। মিসৌরি ও কানসাস এই দুটি রাজ্য পাশাপাশি। বিশ্ববিদ্যালয়ও এক– কানসাস-মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে প্রথমেই মিসৌরি নদী দেখতে গেছিলাম। তবে আমাদের দেশের তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, কাবেরী, কৃষ্ণা মহানন্দা এরা কোথায় পাবে!

আমার মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা আছে। মাঝে মাঝেই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। পাপও ত কম জমেনি। জবা যাই বলুক বিশ্বাসঘাতকতা করলে পাপ লাগেই। আমার দোষেই আমার লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো বউটা আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আমি হালায় একটা নম্বরী হারামজাদা। শুয়ারের বাচ্চা। নইলে ওতে মধু আসনের পরে আজ অবধি কম সে কম পঞ্চাশ ঘরের বউ-মেয়ের সঙ্গে শুই? আর পথের মেয়েরও ত লেখাজোখা নেই। কি দ্যাশে, কি বিদেশে।

আমার মনে হয়, আমার মধ্যে ছোটবেলা থেকে এক গভীর হীনমন্যতা কাজ করে। কিসের জন্যে কার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমি এত নারীকে ভোগ করেছি তা আমি নিজেই জানি না। কিছু নারীকে ভোগ করেছি খেলা খেলতে। বরিশালের আমানতগঞ্জের জবা যেমন বলেছিল। আবার কিছু নারীকে ভোগ করেছি তাকে বা তাদের তীব্রভাবে চেয়েছিলাম বলে। হাজারো নারী আমাকে চেয়েছে শারীকিকভাবে, আমিও চেয়েছি কারো কারোকে। কিন্তু বিধাতার এ এক আশ্চর্য খেলা। যাদের আমি চেয়েছি তারা কুমারী হলে পরম রক্ষণশীল আর বিবাহিতা হলে পরম পতিব্রতা। তাতেই আমার জেদ চেপে গেছে। তাদের রক্ষণশীলতা, তাদের পতিপ্রেম ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে তাদের শিবের মাথায় জল ঢালা, তাদের পতির হিতের জন্যে পূজো-পার্বণ, উপোস করা আমি আমার তীব্র কামনাতে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছি। তারা কেউ আমাকে অপছন্দ করেনি– মনও দিয়েছিল। কিন্তু শরীর কিছুতেই দেবে না বলে পণ করেছিল এবং করেছিল বলেই আমার জেদ চেপে গেছিল। প্রতিবারই তাদের সেই দুর্গকে আমি গুঁড়ো করে দিয়েছি। দুর্দম অশ্বারোহীর মতো তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেঙ্গিস খানের সৈন্যদের মতো তাদের ধর্ষণ করেছি।

এ কি করলে? এ কি করলেন আপনি! বলে, তারা দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠেছে। কিন্তু আমি জানি তারা ব্যাপারটা পুরোপুরিই উপভোগ করেছে। হয়তো পরে অনুশোচনা হয়েছে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, যারাই আমাকে প্রতিরোধ করেছে, তাদের ভাবী পতিদেবতা অথবা বর্তমান স্বামীকে ভগবান করে রেখেছে, তাদের সেই ভক্তিকে ভূলুণ্ঠিত করার পরেই তাদের প্রতি আমার এক গভীর বিতৃষ্ণা জেগেছে। একবারের পরে তাদের কাছে আর ফিরে যাইনি। তাদের বিলাপকে উপভোগ করেছি পুরোপুরি। কিন্তু যাদের সঙ্গে খেলা করেছি তাদের সঙ্গে বারবার খেলেছি। সব রকম রক্ষণশীলতার প্রতি আমার চিরদিনই এক গভীর অনুরাগ ছিল। সামনে ও আড়ালে সেই রক্ষণশীলতাকে বিদ্রূপ করেছি আমি। কোনো নারীর কাছে আমার চেয়েও বেশি প্রার্থিত কোনো পুরুষ আদৌ কেউ থাকতে পারেন এ কথা বিশ্বাস করতেও আমার কষ্ট হয়েছে। তাই সেইসব নারীকে আমি কঠিন শাস্তি দিয়েছি। আমি ধর্ষকাম, স্যাডিস্ট। আমি VOYER-ও বটে। অপরের রতিলীলা অথবা নারীর নগ্নতা আমি আড়াল থেকে দেখতেও এক পরম সুখ অনুভব করেছি ছেলেবেলা থেকে। আমি জানি যে, আমি মানসিক রোগগ্রস্ত কিন্তু এই মানসিকতাই আমাকে গভীর আনন্দ দিয়েছে, আমার সব কাজে, সব সাফল্যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

আমার চিরদিনই মনে হয়েছে বাঙালি পুরুষেরা ম্যাদামারা। অবাঙালি পুরুষদের কাছে তারা চিরদিন হেরে গেছে এই লাজুক, রক্ষণশীল বাঙালি নারীদেরই জন্য। তারা তাদের স্বামীদের কখনও বিছানাতে প্রতিরাতে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেনি, আদরের মাধ্যমে এমন ক্ষমতাবান করেনি যে, পরদিন পুরুষেরা কর্মক্ষেত্রে গিয়ে প্রতিযোগীদের গো-হারা হারিয়ে দেবে।

বাঙালি মেয়েরা, কি হিন্দু কি মুসলমান, বিছানার উপরে চিত হয়ে শুয়ে ছাদের পাখা বা দেয়ালের টিকটিকি দেখেছে অন্যমনে। আর তাদের স্বামীরা নিজেদের জাগিয়েছে, স্ত্রীদের জাগিয়েছে তারপর যা করার করেছে। ওই নারীরা কোনোদিনও যথার্থ কর্মসহচরী হয়তো নিই, সাম্প্রতিক অতীত থেকে উল্টো কর্মজগতের প্রতিযোগী হয়েছে। এখন বাঙালি মেয়েরা ভুলে গেছে যে, তাদের ভূমিকা ছিল Complimentary, Competitive নয়। নারীবাদের ধুয়ো তুলে তারা এক হাজার বছরের স্ত্রী-পুরুষের সুন্দর সুষম মধুর সম্পর্কের ভারসাম্য নষ্ট করতে উঠেপড়ে লেগেছে। তাদের মেধা আছে, বুদ্ধি আছে, নিয়মানুবর্তিতা আছে যে সে কথা তারা কর্মক্ষেত্রে প্রমাণ করেছে। তারা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষকে হারিয়েও দিয়েছে। কিন্তু তারা বোঝেনি যে, জিনস পরলেই আর তসলিমা নাসরিনদের মতো পুরুষকে গাল দিলেই পুরুষ হয়ে ওঠা যায় না। পৌরুষ অন্য জিনিস, তাদের সেই শৌর্য তাদের উত্থিত লিঙ্গতেই সীমাবদ্ধ নয়। পুরুষের যেমন নারীকে দরকার, নারীরও পুরুষকে দরকার– এটাই ভগবান বা আল্লাহর ইচ্ছা। বিধাতার ইচ্ছাকে পদদলিত করার ক্ষমতা পুরুষেরও যেমন নেই।

আমার সবসময়েই মনে হয়েছে যে, নারীরা পুরুষের জীবনের সব শূন্যতা পূর্ণ করে তাই নারীকে পুরুষের দরকার। নারীদের কথা নারীরাই জানে। তাদের পুরোপুরি বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই ত সংস্কৃত প্রবাদ অছে "স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবা না জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ"।

কলকাতাতে আসার পর আমাদের ভবানীপুরের ভাড়া বাড়িতে যদিও ঘর ছিল পাঁচটি, চালঘর ছিল একটি মাত্র। অলক্ষ্যে বাথরুমের দরজাতে একটি ফুটো করে নিই। দেশভাগের পরে দূরসম্পর্কের আত্মীয়, পাড়ার মানুষও

অনেকে এসে উঠতেন আমাদের বাড়িতে। তাদের বাড়ি খোঁজা এবং অন্যান্য কাজ শেষ হলে আবার চলে যেতেন। তাদের মধ্যে যারা মহিলা ছিলেন পনেরো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের তাদের প্রত্যেকের চান করা দেখতাম আমি শিহরিত হয়ে– যেন কোনো নিভৃত-নির্জন বালির চরে কোনো রাজহংসীকে দেখছি। আলাদা তাদের গায়ের রঙ। কালো মেয়েও অনাবৃত হলে তাকে ফর্সা দেখায় আর ফর্সাদের দেখায় লালচে বা গোলাপী। একেক জনের জমন আর বুকের গড়ন একেক রকম। স্তনবৃন্তের রঙ কারো কালো, কারো গোলাপী, কারো পাটকিলে। তাদের সাবান মাখার ভঙ্গি, সাওয়ারের নিচে দাঁড়াবার ভঙ্গি, নিচু হয়ে বালতিতে মগ ডোবাবার ভঙ্গি সবই আলাদা। ছোট-স্তনী মেয়েও যখন নিচু হয় তখন তার স্তনকে বিরাট মনে হয়। তারা কেউ চান করতে করতে গান গায়, কেউ হাসে, কেউ বিড়বিড় করে। দু'হাতের আঙুল দিয়ে তারা যখন তাদের স্ত্রী অঙ্গে সাবান মাখে, গ্রীবাতে সাবান মাখে, মাখে স্তনে তখন তাদের প্রত্যেককে আলাদা করে নেয়া যায়। স্ত্রী অঙ্গের নরম লোম কেউ হেয়ার রিমুভার দিয়ে উঠিয়ে দেয়ায় তখন তাদের শ্রী অঙ্গকে পালক ও চামড়া ছাড়ানো ব্রয়লার চিকেনের মতো দেখায়। কেউ বা সেখানে বড় লোম রাখে। হেমিংওয়ের ভাষায় BUSHY PUSSY CAT-এর মতো। যখন কেউ বসে বা দেয়ালে হেলান দিয়ে স্ত্রী অঙ্গে সাবান মাখে তখন তাদের যোনি দেখা যায়। DOM MORES-এর কবিতার কথা মনে পড়ে যায় তখন তা দেখে- "SHOW ME THE HIBISCUS FLOWER BETWEEN YOUR THIGHS".

জুতার শুকতলার মধ্যে যে এমন একজন ন্যক্কারজনক এবং বৈপ্লবিক মানুষ ছিল তা আমার বা খইরুলের বা আমাদের স্কুলের কারোরই ধারণারও বাইরে ছিল। বিপু লাহিড়ীর ডাক নাম ছিল বিপ্রদাস। অত্যন্ত সুদর্শন, ভদ্র, বিনয়ী এবং মেধাবী ছেলে ছিল সে। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে।

বিপুর ডাইরীর প্রথম খণ্ডের কিছুটা পড়ার পরই থামতে হলো। একসঙ্গে এর চেয়ে বেশি হজম হবে না। সবচেয়ে যা আশ্চর্য করেছিল আমাকে তা তার সাহস। আমাদেরই চেনাজানার মধ্যে হয়তো অনেক জুতার শুকতলার মতো মানুষ আছে যাদের মুখোশের আড়ালের মুখের কোনো খোঁজ আমরা পাইনি বা রাখিনি। এই রকম অকপট স্বীকারোক্তি খুব কম মানুষই করতে পারে। আমরা যে সকলেই ধোয়া তুলশী পাতা এমন ত নয়। আমাদের অনেকেরই কম-বেশি কুকীর্তি বা সুকীর্তি আছে কিন্তু সে সব আমরা সযতনে লুকিয়ে রাখি। এমন TRUE TO ONESEL– নিপাট ভণ্ডামিহীন মানুষ পৃথিবীতে ক'জন আছেন আমি জানি না।

তবে খইরুল আমাকে বড়ই বিপদে ফেলল। ও যদি এই ডাইরীর এক পাতাও পড়তো তবে হয়তো আমাকে এই বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলতো না। এই 'বিপু লাহিড়ীর জীবনচরিত' নিয়ে আমি এখন কি করব?

কোন প্রকাশক বা পত্র-পত্রিকা এ লেখা ছাপবে? ইংরেজীতে যা ছাপা যায়, যা পড়া যায়, তা কি বাংলাতে ছাপা ও পড়া যায়? আমরা যে সকলেই ভণ্ডচূড়ামণি।

যতটুকু পড়লাম একবারে বসে ততটুকুই কোনো পত্রিকার সম্পাদককে জেরক্স করে দেব। যদি তিনি না ছাপেন তবে অন্য কারোকে দেখাব। তবে আমার মনে হয় কেউই জুতার শুকতলার এই আত্মজীবনী ছাপাতে রাজি হবেন না। বলবেন, মশায় এ তো আত্মজীবনী নয়, আত্মরতি। আত্মরতিও ত একটি হর্দম সত্য। ঘটনা। ঘরে–ঘরের ঘটনা– স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে– কিন্তু সে কথা স্বীকার করার মতো সাহস আমাদের মধ্যে ক'জনের আছে?

বিপু আত্মহত্যা করে মরে গেছে বলেই ওর অন্তিম ইচ্ছার দাম দেয়ার জন্য আমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে। যদি কেউ ছাপেন তবে তাকেই পুরোটা দিয়ে দেব। কোনো প্রকাশক ছাপতে রাজি হলে তাকেই দিয়ে দেব সরাসরি বই ছাপার জন্য।

আমার সুনাম আছে সুরুচিসম্পন্ন, শিক্ষিত রোমান্টিক লেখক হিসেবে। আমি এই ধরনের একটি বই ছাপার জন্য উমেদারী করছি এ কথা জানলে আমার পাঠক এবং বিশেষ করে পাঠিকাকুল কি ভাববেন আমাকে কে জানে! কিন্তু বিপু যে আমাদের ছেলেবেলার সাথী, অনেক খেলা, অনেক দুরন্তপনা করেছি ওর সঙ্গে। ওর অন্তিম ইচ্ছার দাম না দিয়েই বা কি করি!

আমাদের মধ্যে খইরুলটাই ছিল সবচেয়ে অসভ্য, মেয়েদের ব্যাপারে, কথা-বার্তায়, বিপু যে খইরুলকে দশ

গোল দিয়ে দিয়েছে তা খইরুল জানলে খুব মজা পাবে। কিন্তু রসিকতা করবে এ লেখা নিয়ে যার সঙ্গে সে তো সব রসিকতা, মান-অপমানের বাইরে চলে গেছে।

আমি নেকুষুপুটু-মুনু এখন এ লেখা নিয়ে কি করি তাই ভাবছি। মহাবিপদেই পড়লাম।

For More Books Visit www.MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com